Bhatter college ,Dantan

Department of history

Priyaranjan Patra

Class:4th sem (P.G)

Paper :401

Note :Fimale Practitioners of Western Medicine

Scanned with CamSc

❑ ৬৪.৪ পশ্চিমী ঔষধ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের নারী অনুশীলনকারীরা (Female Practitioners of Western Medicine)

ঔপনিবেশিক ভারতে মাদ্রাজেই প্রথম মেডিক্যাল কলেজের দরজা মহিলাদের জন্যে খুলেছিল মেরি শেরলির ও তাঁর সহপাঠিনীদের ভর্তির মাধ্যমে। তারপর থেকে সেখানে ইউরোপীয় ও ইউরেশিয় মেয়েরা পড়তেন। কলকাতায় ১৮৭৫ সালে নীলকমল মিত্রের তাঁর দৌহিত্রীকে মেডিক্যাল পড়ানোর আবেদনের পরে (যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে) ১৮৭৮ সালে আর একটি আবেদন জানানো হয়েছিল কিন্তু সেসময়েও মেয়েদের মেডিক্যাল পড়া হয়নি। ১৮৮১ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আবার নতুন করে কয়েকজন মহিলা ডাক্তারি পড়তে চেয়েছিলেন। ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের পথিকৃৎ রূপে যে দু'জনের নাম পাওয়া যায়— আনন্দবাই যোশি ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। তাঁরা ১৮৮৩ সালে মেডিক্যাল পড়া শুরু করেন।

আনন্দ বাঈ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৫ সালের ৩০ মার্চ। পুনা বা থানে জেলার অন্তর্গত কল্যাণের দরিদ্র, গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম গণপতরাও যোশি। মা ছিলেন গঙ্গাবাই। ছোটবেলায় বাবা তাঁকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছিলেন এবং সামান্য লেকাপড়া শেখেন। ১৮৭৪ সালের ৩১ মার্চ তাঁর বিয়ে হল ২৭ বছর বয়সী, বিপত্নীক গোপাল রাও বিনায়ক যোশির সঙ্গে। বিয়ের পর আনন্দি পড়াশুনায় উন্নতি করেন স্বামীর আগ্রহে। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভুগোল শিখেছিলেন। ১২ বছর বয়সে আনন্দ মা হলেন কিন্তু তাঁর শিশু সন্তানের মৃত্যু হল। তাঁর স্বামী ডাকবিভাগের সামান্য কর্মচারী ছিলেন কিন্তু আনন্দকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

Scanned with CamSc

বিভিন্ন জায়গায় তিনি চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। প্রিন্সটন, নিউ জার্সির রেভারেন্ড ওয়াইল্ডারকে সাহায্যের আবেদন করে লেকা গোপালের চিঠি ছাপা হয়েছিল ১৮৭৮-এর সেপ্টেম্বর। ১৮৮০ সালে নিউজার্সির বি. এফ. কার্পেন্টার প্রিন্সটন-এর Missionary Review-তে এই চিঠি পড়েছিলেন। তিনি চিঠি লিখলেন আনন্দকে এবং এরপর থেকে দু'জনের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হচ্ছিল। ১৮৮১ সালের ২০ জানুয়ারির একটি চিঠিতে আনন্দ লিখেছিলেন, "I already wish and feel that of should call you my aunt. There is a saying among us," it does not matter much if a mother dies, but let not an aunt die." কারপেন্টার খুব দ্রুত এ বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। আনন্দ লিখেছিলেন, "...we women are very backward over here. ...I am learning Sanskrit so that I could teach the Americans the wisdom from our shastras and Vedas... I will go to America. I will succeed. I will not show my face to mother India if I fail, I want to show to the whole world of what stuff Hindu women are made!"...

বিদেশযাত্রার প্রস্তুতিপর্বে দুজনের অসামান্য সংগ্রাম চলে। শেষপর্যন্ত ঠিক হল তিনি একাই যাবেন আমেরিকা। শ্রীরামপুরে কলেজের এক জনসভায় তিনি আমেরিকা যাত্রার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। ১৮৮৩ সালের ৭ এপ্রিল ১৮ বছর বয়সী আনন্দ বিদেশ যাত্রা করলেন। জাহাজে। নিউইয়র্কে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন কার্পেন্টার। ১৮৮৩ সালের অক্টোবরে পেনসিলভ্যানিয়ার ফিলাডেলফিয়াতে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে তিনি যোগদান করেন। প্রিন্সিপ্যাল Rechel Bodley তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। স্পলারশিপ পেয়েছিলেন আনন্দ। আনন্দকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আনুমানিক ১৮৮৬ সালের ১১ মার্চ তিনি এম ডি ডিগ্রি লাভ করলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিতা রমাবাই।

ডাক্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বম্বে প্রেসিডেন্সীর দেশীয় রাজ্য কোলাপুরে সদ্য সৃষ্ট মহিলা ডাক্তারের পদে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলেন। কিন্তু ফেরার সময় আনন্দ অসুস্থ ছিলেন। ১৮৮৬ সালে ৮ অক্টোবর রওনা দিয়ে ১৬ নভেম্বর তাঁরা বোম্বাই-এ পৌঁছলেন। আনন্দ কোলাপুরে কাজে যোগ দিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বেড়ে চলল। যক্ষ্মা রোগ বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করল। ১৮৮৭ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা গেলেন।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী বসু ছিলেন ভাগলপুরের ব্রজকুমার বসুর কন্যা। কলকাতার বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষক চিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি। কাদম্বিনী জন্মেছিলেন ১৮৬১-তে। একসময়ের শিক্ষক ও পরবর্তীকালে স্বামী দ্বারকানাথের কাছে তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করেছিলেন তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা নারী শিক্ষার ব্যাপরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কাদম্বিনী মেডিক্যাল পড়ার জন্য প্রথম আবেদন জানিয়েছিলেন ১৮৮১ সালে। কিন্তু সে সময়ে তা ফলপ্রসূ হয়নি। কাদম্বিনী তখন বি.এ পাস করেন। ১৮৮৩-তে তিনি আবার আবেদন জানিয়েছিলেন। সরকারের তরফ থেকে তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে অনুমতি দেওয়া হল। ১৮৮৩ সালেই কাদম্বিনী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেন। এর কিছু পরেই তাঁর বিবাহ হল ব্রাহ্ম সংস্কারক ও কলকাতার বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষক দআরকানাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে। সমসময়িক অনেকের মতে কাদম্বিনীর মেডিক্যাল পড়ার পিছনে ছিল দ্বারকানাথের প্রবল উৎসাহ ও প্রেরণা। 'পরিচারিকা' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, ''নারীগণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা না করিলে নারীজাতিসুলভ নানাপ্রকার কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারবি না এবং নারীজাতির স্বাধীন বীবিক অর্জনের পথ উন্মুক্ত হইবে না এজন্য তিনি সর্বপ্রথম আপনার পত্নীকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন।'' কাদম্বিনী এম বি পরীক্ষায় সব বিষয়ে সফল হলেও মেডিসিনে প্রয়োজনীয় নম্বরের সামান্য কম পেয়েছিলেন। অনেকের মতে জনৈকা নারী বিদ্বেষী অধ্যাপক তাঁকে তাঁর পরীক্ষিত বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অহেতুক ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. কোট্স কাদম্বিনীকে জি. এম. সি বি অর্থাৎ 'গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল কলেজ বেঙ্গল' উপাধি দিয়ে প্রাকটিশ করার অনুমতি দিলেন। কাদম্বিনীই ভারতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা পেশাগত যোগ্যতার অধিকারিণী মহিলা চিকিৎসক। সপল ও যোগ্য চিকিৎসক রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৮৮৮ বা ১৮৯০ সালে কাদম্বিনী লেডি ডাফরিন হাসপাতালে চাকরিতে যোগ দেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল তিনশ টাকা। তাঁর ডাক্তারি পসারও ছিল যথেষ্ট জমজমাট। ১৮৮৮ সালে 'বেঙ্গলি' কাগজে তিনি একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যেটি এক বছর ধরে নিয়মিত ছাপা হত।

Scanned with CamSc

A CARD

Mrs. Gangulee, BA

(45/5 Beniatola Lane, College Square North East Corner, Calcutta) Having Studied in the Medical College for five years and obtained a college diploma to practise.

MEDICINE, SURGERY and MIDWIFERY has commenced practise and treats women and children Consultation free for poor patients at her home between 2 and 3 daily.

কাদম্বিনীর খ্যাতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তিন বছর পরে তিনি বাড়ি বদল করেন এবং নতুন বিজ্ঞাপন দেন এইভাবে

MRS. GANGULI BA GMCB

Medical Practitioner

Can be committed at her residence 57 Sukia Street, Calcutta where she has now removed, term moderate.

কাদম্বিনীকে যেমন সাহায্য করেছিলেন তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির মত অগ্রসর মনোভাবে অধিকারী পুরুষরা, তেমনি রক্ষণশীল সমাজের একাংশ তাঁর কাজকর্ম, পেশাগত সাফল্য কোন কিছুকেই মেনে নিতে পারেননি। কাদম্বিনীর খ্যাতি-প্রতিপত্তির ক্রমবৃদ্ধির জন্যই সম্ভবত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাগোষ্ঠী তাঁর উদ্দেশ্যে খুব অপমানজনক কটুক্তি করেন। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কাদম্বিনীকে Whore বলে সম্বোধন করে কাদা ছোঁড়া হয়েছিল। কাদম্বিনীর এ অপমান দ্বারকানাথ মেনে নিতে পারেননি। তিনি বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নীলরতন সরকারের সাহায্যে 'বঙ্গবাসী' কোষ্ঠীর সাপ্তাহিক 'বঙ্গনিবাসী'র সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে মানহানির মালা দায়ের করলে। মামলায় দ্বারকানাথ জয়ী হন। মহেশচন্দ্র পাল দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং তাঁর একশো টাকা জরিমানা ধার্য হল ও দু'মাসের জেল। বাঙালি হিন্দু রক্ষণশীলরা মহিলাদের স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁরা ভাবতেন যে 'অন্দর' বা 'অন্তঃপুর' ও বহির্জগতের মধ্যে বিভাজনরেখা মেনে মেয়েরা অন্দরের জগতেই বিচরণ করবে। বহির্জগতে মেয়েরা পেশার সূত্রে প্রবেশ করলেও তাঁদের 'সতীত্ব', 'পবিত্রতা'— এসব অনুসরণে বিঘ্ন ঘটবে। সম্ভবত তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, যদি মেয়েরা কাদম্বিনীর উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীন পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য এগিয়ে আসে এবং সফল হয় তাহলে নারীর উপর অনুশাসন শিথিল হবে, পিতৃতান্ত্রিক দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে। নিজের সাহস ও স্বামীর উৎসাহে কাদম্বিনী অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ইংলন্ডে গিয়েছিলেন উচ্চতর শিক্ষা ও ডিপ্লোমা লাভের জন্য এবং সফল হয়ে ফিরে আসেন।

সাহসিনী কাদম্বিনী সমাজে নিন্দার পাত্রী হয়েছিলেন, আর কাজের জায়গায় হয়েছিলেন বর্ণবৈষম্যের শিকার। ১৮৮৫-এর পরে Dufferin Fund-এর বহু হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারি চালু হয়েছিল। কিন্তু এসব জায়গায় চাকরিতে নিয়োগের সময় পক্ষপাতিত্ব দেখানো হত শ্বেতাঙ্গিনী ডাক্তারদের। দাকম্বিনীর ক্ষেত্রেও এরক ঘটেছিল। ১৮৯১-এ অস্থায়ী পদে কর্মরতা কাদম্বিনীকে বঞ্চিত করে মেমসাহেব ডাক্তারকে স্থায়ীভাবে চাকরিতে নিযুক্ত করা হল। কাদম্বিনীর অভিযোগ ছিল যে উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় মহিলাদের হাসপাতালের উঁচু পদগুলিতে কখনো নিয়োগ করা হত না। তাঁদের বাদ দিয়ে সাদা চামড়ার ডআক্তারদের নিয়োগ করা হচ্ছে ও এর ফলে ভারতীয় মহিলা ডাক্তররা নিজেদের অভিজ্ঞাত ও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছেন না।

যতদূর জানা যায় কাদম্বিনী ১৮৯৫ বা ১৮৯৬ সালে নেপালের রাজপাতার চিকিৎসার ভার নিয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। কাদম্বিনী ভারতরে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯২৩-এর ৩ অক্টোবর তিনি মারা গিয়েছিলেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট বিধুমুখী বসুর জন্ম হয় ১৮৬৬ সালে, ১৮৯০ সালে তিনি এম. বি. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। তাঁর কথা ইতিমধ্যেই আলাচিত।

ডাক্তারী পেশায় নিযুক্ত বাংলাদেশের আর একজন মহিলার (হেমবতী সেন) কতা এখানে আলোচিত হবে কারণ তিনি চিলেন চিকিৎসকের পেশায় নিযুক্ত আর একটি স্তরের প্রতিনিধিস্থানীয়া— যাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে মেডিকেল কলেজের

Scanned with CamSc

গ্রাজুয়েট বা সার্টিফিকেটের অধিকারিণীদের তুলনায় দ্বিতীয় স্তরভুক্ত ছিলেন ও সেই জন্য কর্মক্ষেত্রেও ছিলেন নিম্নতর পদের অধিকারিণী। এঁরা VLMS (Vernacular Licentiate in Medicine and Surgety) ডিক্রীর অধিকারী রূপে Hospital Assistant পদে যোগ দিতে পারতেন।

১৮৭২ সালে শিয়ালদা মেডিক্যাল স্কুল বা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দেশীয় ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষার ক্লাসের ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার জন্য এই ক্লাসগুলি ক্যাম্পবেলে স্থানান্তরিত করা হল। ১৮৮৭ সালের ১৫ জুলাই প্রস্তাব করা হয়েছিল যে ভারনাকুলার ক্লাসে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করা হোক, তা হলে এই স্কুলের ছাত্রীরা গ্রামে গিয়ে প্র্যাকটিশ করতে পারবে এবং তার ফলে অনেকে উপকৃত হবে। একমাস আগে বামাবোধিনী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াচে। যে সকল স্ত্রীলোক সামান্য রূপ বাঙালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন ও পার্টিগণিতের ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক পর্যন্ত শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ভর্তি করা হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগের দশজন বিনা বেতনে শিক্ষা করিবেন ও লেডি ডাফরিন ফান্ড হইতে বৃত্তি পাইবেন।' এছাড়াও নানারকম সুব্যবস্থার তালিকা দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে যে 'ইহাদ্বারা আমাদের দেশের একটি বিশেষ অভাব দূর হইবে'। পরের মাসে ওই পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অনেক ছাত্রী ভর্তি হয়েছেন আর ক্যাম্বেলের স্কুলে দশ-বারোজন ভর্তি হতে চাইছেন। সব ঠিকঠাক হতে সময় লাগল আরও এক বছর। তখন স্থির হল যে মেয়েদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধে থাকবে। যেমন, ছাত্রদের বয়ঃসীমা ষোলো থেকে তেইশের মধ্যে ধরা হলেও মেয়েদের ময়সের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে না দিয়ে সেটা ছেড়ে দেওয়া হল সুপারিনটেনডেন্টের ওপর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাত্রদের প্রবেশিক পাশ কিংবা দুটি বিষয়ে পাশ করিতে হত। মেয়েদের আপার প্রাইমারী স্কলারশিপ পরীক্ষা পর্যন্ত পড়লেই চলত, প্রয়োজনে কলেজ শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিতেন। বাংলা বই পড়তে পারা ও ব্যাখ্যা করতে পারা, শ্রুতিলিখন ছাড়াও ভগ্নাংশ, ত্রৈরাশিক কষতে পারা ছিল আবশ্যিক। ক্লাসে পর্দা ব্যবহার হবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছিল। শেষে স্থির হল মেয়েরা সামনের দিকে বেঞ্চগুলিতে বসবে। শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে পর্দা থাকবে। ১৮৯৫ সালে একশোজন ছাত্রীর বাসোপযোগী ইলিয়ট লেডিজ হস্টেল তৈরি হবার আগে পর্যন্ত ক্যাম্বেল স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রী থাকতেন স্বর্ণময়ী হস্টেলে। মেয়েদের জন্যে নানারকম আর্থিক সুবিধেও দেওয়া হল— ভর্তি ফী নেই, টিউশন ফী নেই, প্রথম দশজনকে সাত টাকা মাসিক হারে ডাফরিন স্কলারশিপ দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক ক্লাসে যে প্রথম হবে তাকে দেওয়া হবে আঠারো টাকার বিশেষ পুরস্কার। ১৮৮৮ সালের জুন মাসে পনেরোজন ছাত্রী নিয়ে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ভারনাকুলার ক্লাস শুরু হল। মেডিক্যাল স্কুল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের খুব বেশি আকৃষ্ট করেছিল তবে ছাত্রীদের অধিকাংশই ছিলেন দেশীয় খ্রিস্টান। একই কথা বলা চলে পাঞ্জাব, আগ্রা, ভেলোর, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের ছাত্রী সম্বন্ধেও। কলকাতার আগেই এ সব স্কুলের মেয়েদের শিক্ষা শুরু হয়েছিল। ১৮৮৭ সালে আগ্রার মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন সাতচল্লিশজন ছাত্রী। এঁদের মধ্যে একত্রিশজনই ছিলেন খ্রিস্টান।

ক্যাম্বেল স্কুল থেকে যাঁরা পাশ করতেন তাঁদের তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সের শেষে VLMS উপাধি দেওয়া হত। এই স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্রীরা পাশ করেছিলেন ১৮৯১ সালে। এই বছরেই ক্যাম্বেলে ভর্তি হয়েছিলে হৈমবতী সেন। বিবাহপূর্বে তিনি ছিলেন মিত্র। ১৮৬৬ সালে তিনি জন্মেছিলেন খুলনার এক সম্পন্ন জমিদার পরিবারে। দশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, কিন্তু এক বছরের মধ্যে তাঁর স্বামী মারা গেলেন। বাবা-মায়ের মৃত্যু, শ্বশুরবাড়িতে আত্মীয়দের দুর্ব্যবহার এই সব বিপর্যয়ের ফলে তিনি বেনারসে চলে যান ও একটি ছোট স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৮০-এর দশকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে বিধবাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে শুনে হৈমবতী কলকাতায় এলেন এবং ১৮৯০-এ তাঁর বিবাহ হল ব্রাহ্মপ্রচারক কুঞ্জবিহারী সেন এর সঙ্গে। হৈমবতী ছিলেন ক্যাম্বেলের কৃতী ছাত্রী। ১৮৯৪-এ তিনি হুগলির ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে যোগ দিয়েছিলেন 'হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে।

চাকরি জীবনে হৈমবতী নিগ্রহের শিকার হয়েছিলেন। পদাধিকার বলে Assistant Surgeon ও Civil Surgeon তাঁর পেশাগত আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। Assistant Surgeon বদ্রিকানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার ও অশোভন আচরণ করতেন। Civil Surgeon-এর কাছে প্রথমবার অভিযোগ জানিয়ে কোনো প্রতিকার হয়নি। হৈমবতী চাকরির পাশাপাশি

Scanned with CamSc

ব্যক্তিগত পসারও জমিয়েছিলেন। তাঁর উপার্জনে সংসার চলত, অথচ রোজগারহীন স্বামীর নানা খামখেয়ালীপনা, সাংসারিক প্রভুত্ব তাঁকে সহ্য করতে হত। পাঁচ সন্তানের জননী হৈমবতী ক্যানসার রোগে মারা যায় ১৯৩৩-এ।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষিতা মহিলাদের পেশাদারী ডিগ্রি অর্জন মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও আত্মনির্ভরতার পথে এক বিরাট পদক্ষেপ ছিল। এঁরা অনেকেই সামাজিক হেনস্থা ও প্রতিকূলতার স্মুখীন যেমন হয়েছিলেন কোনো কোনো অংশের সহযোগিতাও পেয়েছিলেন। তাঁদের সাহস ও কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে মহিলাদের অগ্রগতির পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

Scanned with CamSc